ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৩

(মৌলিক ইবাদত ও মাসায়েল)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

নামাজ

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ	১৫
নামাজের গুরুত্ব	২২
মুয়াজ্জিনের আহ্বান	৩২
কীভাবে পাক-পবিত্র হব	৪০
নামাজের নিয়ম	৪৮
আরও কিছু নামাজ	৬০
নামাজের আরও কিছু বিষয়	৭১

অধ্যায়-২

দায়িত্ব ও অন্যান্য অনুশীলন

জাকাত কী	৮১
রোজা পালনের পদ্ধতি	৯১
হজ	১০৪
তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব	১১৪

অধ্যায়-৩

ফিকাহ ও শরিয়াহ

ইসলামি আইন	১৩১
মাজহাবসমূহ	১৩৫
হালাল ও হারাম খাবার	১৪৪

হালাল উপার্জন ১৫০
অমুসলিম বন্ধুত্ব ১৫৫
বিয়ের পদ্ধতি ১৬০

অধ্যায়-৪

ইসলাম প্রতিষ্ঠা

ইসলামি শিষ্টাচার ১৬৯
মুসলিম পরিবার ১৭৪
ইসলামি সমাজ কী ১৭৯
ইসলামের রাজনৈতিক ধারণা ১৮৬
ইসলামের আলোকে জীবনযাপন ১৯৩

ইসলামের পাঁচ স্তম্ভ

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ কীভাবে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ইসলাম হলো একটি দ্বীন, তথা জীবনপদ্ধতি। ইসলামের এটাই সঠিক সংজ্ঞায়ন। কারণ, মুসলিম হিসেবে জীবনযাপন করাটা অন্য যেকোনো মতবাদ বা আদর্শ লালন করার তুলনায় একেবারেই আলাদা। প্রশ্ন হলো—ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে সাধারণ একটি ধর্মের কাঠামোতে না থেকে ইসলাম একটি জীবনপদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃত হচ্ছে?

ইংরেজি শব্দ 'রিলিজিয়ন' এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'রিলিজিও' থেকে, যা দিয়ে একগুচ্ছ বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকে বোঝানো হয়। অন্যভাবে বলা যায়—যে বিষয়গুলো একদল মানুষকে একই ধরনের আচরণে উদ্‌বুদ্ধ করে; তা ভালো বা মন্দ যাই হোক না কেন, এটাই হলো রিলিজিও। এ কারণে খ্রিষ্টবাদ, ইহুদিবাদ, বৌদ্ধ বা হিন্দুত্বকে ধর্ম বা রিলিজিয়ন বলা হয়। কেননা, এগুলো সবই মানবিক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত।[১]

অন্যদিকে ইসলাম শুধু কিছু মানদণ্ড নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। ইসলাম এ বিবেচনার আরও ঊর্ধ্বে উঠে ভালো ও মন্দের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়। পাশাপাশি ইসলাম যে বিশ্বাসের কথা বলে, তাকে সামাজিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে প্রয়োগ করাও এর অন্যতম দাবি। আপনি ঈমান আনবেন অথচ ঈমানি চেতনার কোনো প্রতিফলন জীবনে থাকবে না, এমনটা হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। রিলিজিয়ন বা ধর্মে এ সুযোগ আছে, কিন্তু দ্বীন ইসলামে একেবারেই নেই।

মুসলিম হওয়ার জন্য শুধু আল্লাহতে ঈমান আনাই যথেষ্ট নয়; বরং নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনে আল্লাহর হক আদায় করাও অপরিহার্য। আর আল্লাহর হক আদায় করার একমাত্র উপায় হলো ইবাদত করা। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সাথে যে চুক্তি করেছেন, তার আলোকে ইবাদত করা আমাদের অপরিহার্য একটি দায়িত্ব। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'হে ঈমান আনয়নকারীগণ! আমি কি তোমাদের এমন একটি ব্যবসায়ের সন্ধান দেবো, যা তোমাদের কঠিন আজাব থেকে মুক্তি দেবে? তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান

---

[১] সূরা তাগাবুন : ৫-৬

আনো এবং আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ও জান-প্রাণ দিয়ে জিহাদ করো; এটাই তোমাদের জন্য অতিব কল্যাণকর, যদি তোমরা তা জানো। আল্লাহ তোমাদের গুনাহ মাফ করে দেবেন এবং তোমাদের এমন সব বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার নিচে দিয়ে ঝরনাধারা বয়ে চলবে। আর চিরস্থায়ী বসবাসের জায়গা জান্নাতের মধ্যে তোমাদের সর্বোত্তম ঘর দান করবেন। এটাই বড়ো সফলতা। আর আরেক জিনিস—যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো, আল্লাহ তাও তোমাদের দেবেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য এবং অতি নিকটবর্তী সময়ে বিজয়। হে নবি! ঈমানদারদের এর সুসংবাদ দান করো।'[২]

যদি আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান আনার দাবি করি; কিন্তু তাঁর নির্দেশনা মানতে অস্বীকার করি, তাহলে তা প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইসলামি জীবনযাপন করার অর্থ হলো—একজন মানুষকে প্রতিনিয়ত আল্লাহর প্রতি তার দায়িত্বগুলো স্মরণ করতে হবে। মানুষের জন্য এভাবে অভ্যস্ত হওয়া জরুরি।

কেননা, মানুষকে আল্লাহ এমনভাবে তৈরি করেছেন—একটু সুযোগ পেলেই সে তার দায়িত্বের কথা ভুলে যায়, অবহেলা করতে শুরু করে। এমনটা হয়, কেননা প্রবৃত্তি আমাদের কাবু করার চেষ্টা করে। আবার শয়তানও নানাভাবে আমাদের ওয়াসওয়াসা দিয়ে যায়। জাগতিক ব্যস্ততা, পেরেশানি আর মোহ আমাদের আল্লাহকে ভুলে যেতে যেন প্রলুব্ধ করে।'[৩]

এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা পৃথিবীতে তাঁর পক্ষ থেকে সর্বশেষ হিদায়াত প্রেরণ করে একটি প্রশিক্ষণ প্রকল্প প্রদান করেছেন, যা আমাদের আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। পূর্ববর্তী নবি-রাসূলগণ নামাজ বা রোজার মতো ইবাদতগুলো তাঁদের উম্মতকে শিখিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু তাঁদের উত্তরাধিকারীরা সেগুলোর সবই ভুলে গেছে বা বিকৃত করে ফেলেছে, তাই পূর্ববর্তী ধর্মগুলো এখন রীতিমতো প্রহসনে পরিণত হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—এখন ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের অধিকাংশই আর রোজা রাখে না; যদিও ঈসা (আ.) ও দাউদ (আ.) রোজা রেখেছেন। যে দু-চারজন রোজা রাখেন, তারা বছরে দু-একদিন বা দু-এক সপ্তাহ রোজা রাখেন। আর তাদের এ রোজা রাখার অর্থ হলো—চকলেট না খাওয়া, গোশত আহার না করা, প্রিয় খাবারগুলো না খাওয়া ইত্যাদি। ইহুদি বা খ্রিষ্টানদের রোজার মধ্যে এখন আর আধ্যাত্মিকতার কোনো ছোঁয়া নেই।[৪]

ইসলামি জীবনাচরণ

ইসলামি জীবনযাপনজুড়ে আছে পাঁচটি মৌলিক অনুশীলন। প্রতিটি মুসলিম নরনারীর এ পাঁচটি কাজকে জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নিতে হয়। এ আচারাদিগুলোকে বলা হয় 'আরকানুল ইসলাম' বা 'ইসলামের ভিত্তি বা স্তম্ভ'। এ পাঁচটি মূল স্তম্ভ হলো একধরনের ওয়েক আপ কল, যা

---

[২] সূরা আস সফ : ১০-১৩
[৩] সূরা ইনফিতার : ৬-৯
[৪] সূরা বাইয়্যিনাহ : ৫

আমাদের মন ও অন্তরকে প্রশান্ত করে। ফলে আমরা বারবার জীবন সম্বন্ধে বিশুদ্ধ ধারণা লাভ করি এবং দুনিয়ায় আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠি।

ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভ হলো শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়া, সালাত বা নামাজ, জাকাত, সাওম বা রোজা এবং হজ। এই আমলগুলোর কোনোটা প্রতিদিন করতে হয় আবার কোনোটা জীবনে একবার করলেও হক আদায় হয়ে যায়। ইবনে উমর (রা.) হতে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন—

> 'পাঁচটি স্তম্ভের ওপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত। এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃতপক্ষে আর কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল, সালাত কায়েম করা, জাকাত আদায় করা, হজ পালন করা এবং রমজান মাসের সিয়াম পালন করা।'[৫]

প্রথম স্তম্ভ তথা শাহাদাহ'র বিষয়ে এর আগে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত শাহাদাহ হলো একটি ঘোষণা। একজন মানুষ তখনই শাহাদাহ বা ঘোষণার জানান দেয়, যখন সে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর নিকট সমর্পণ করে তথা মুসলিম হয়ে যায়। কোনো ব্যক্তি আন্তরিক ও একনিষ্ঠভাবে এ ঘোষণা দেওয়ার আগ পর্যন্ত সত্যিকারের মুসলিম হতে পারে না।

এমনকি যদি সে ব্যক্তি কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়, তবুও নয়। এ ঘোষণাই একজন মুসলিমকে কাফিরদের থেকে আলাদা করে দেয়। প্রথমবার শাহাদাহ'র ঘোষণা দেওয়ার পর একজন মানুষ ইসলামের ভেতর প্রবেশ করে এবং তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। সাক্ষ্য দেওয়ামাত্রই একজন মানুষের হিসাব-নিকাশ নতুন করে শুরু হয়। অর্থাৎ গুনাহমুক্ত হয়ে সে রীতিমতো সদ্য ভূমিষ্ঠ মাসুম বান্দায় পরিণত হয়ে যায়।

ইতিবাচকতা ও নেতিবাচকতা

শাহাদাহ বা সাক্ষ্য দেওয়ার ঘোষণাটির দুটি অংশ আছে। প্রথম অংশে একটি বিষয়কে খারিজ করা হয় আর দ্বিতীয় অংশে অন্য একটি বিষয়কে দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা হয়। কালিমা শাহাদাতে এই ঘোষণাই দেওয়া হয়—

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

> 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই, তিনি এক ও একক, তাঁর কোনো শরিক বা অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহ তায়ালার অতি প্রিয় খাস বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

---

[৫] বুখারি ৮; মুসলিম ১৬; তিরমিজি ২৬০৯; নাসায়ি ৫০০১; মুসনাদে আহমাদ : ৬০১৫; সহিহ ইবনু খুজায়মা : ১৮৮০

নামাজের গুরুত্ব

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—আমাদের জীবনের জন্য নামাজ কেন এতটা গুরুত্বপূর্ণ।

নামাজ কী

ঈমান আনার পর একজন মুসলিমের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো নামাজ আদায় করা। এটি বিশেষ একটি ইবাদত, যা মুসলিমরা শুধু আল্লাহর জন্যই আদায় করে। 'সালাত' আরবি শব্দ, যার শাব্দিক অর্থ 'সংযোগ'। সালাতের মাধ্যমে বান্দার সাথে আল্লাহর যোগাযোগ ও সম্পর্ক তৈরি হয়। আল কুরআনে অসংখ্য আয়াত আছে, রাসূল (সা.)-এর অসংখ্য হাদিস আছে, যেগুলোতে মুসলিমদের যথাযথভাবে সালাত আদায় করতে বলা হয়েছে। সালাত হলো ঈমানের ভিত্তি। রাসূল (সা.) বলেন—'আল্লাহর সবচেয়ে কাছাকাছি একজন বান্দা তখনই পৌঁছতে পারে, যখন সে সিজদায় যায়।'

যদি আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতার সাথে সালাত আদায় করা হয়, তাহলে সালাতের মাধ্যমে অন্তর পরিশুদ্ধ হয়। সালাত মানুষের জীবনকে ইতিবাচকভাবে পালটে দেয়। মানুষ ভেতর থেকে শান্তি ও স্বস্তি অনুভব করে। সালাত মানুষকে নিশ্চয়তা দেয়, জীবনে এনে দেয় শৃঙ্খলা। সালাত বান্দার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, সত্যনিষ্ঠা এবং আল্লাহভীরুতার জন্ম দেয়।[৬]

সালাত আমাদের মধ্যে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ জন্মায়। আমাদের মানুষ হিসেবে উন্নত করে। এ কারণে ইসলাম অন্য সব ধর্মীয় আচারাদির তুলনায় নামাজের ওপর বেশি গুরুত্বারোপ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'তোমার প্রতি ওহির মাধ্যমে যে কিতাব পাঠানো হয়েছে, তা তিলাওয়াত করো এবং নামাজ কায়েম করো। নিশ্চিতভাবেই নামাজ অশ্লীল ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণ এর চাইতেও বড়ো জিনিস। আল্লাহ জানেন, তোমরা যা কিছু করো।'[৭]

রাসূল (সা.)-এর কাছে গিয়ে কোনো মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি সবার আগে তার কাছ থেকে এ প্রতিশ্রুতি নিয়ে নিতেন—মানুষটি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরজ নামাজ আদায় করবে।

---

[৬] সূরা রাদ : ২৮

[৭] সূরা আনকাবুত : ৪৫

কালিমা শাহাদাহ উচ্চারণের পর একজন মুমিনের জন্য সালাত হলো সেই কাঙ্ক্ষিত দরজা, যার মাধ্যমে সে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'আমার আয়াতের প্রতি তো তারাই ঈমান আনে—যাদের এ আয়াত শুনিয়ে যখন উপদেশ দেওয়া হয়, তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসা সহকারে তাঁর মহিমা ঘোষণা করে এবং অহংকার করে না। তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, নিজেদের রবকে ডাকে আশঙ্কা ও আকাঙ্ক্ষা সহকারে এবং যা কিছু রিজিক আমি তাদের দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।'[৮]

আমরা হাদিস থেকে জেনেছি, সালাতকে অবহেলা করা একধরনের কুফুরি। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। যারা সালাত আদায় করে না, তাদের ঈমান আছে কি না সন্দেহ। রাসূল (সা.) বলেছেন—

> 'ঈমানদার ও ঈমানহীন বান্দাদের মধ্যে পার্থক্য গড়ে দেয় সালাত। যে ব্যক্তি সালাত ত্যাগ করে, সে একটি কুফুরি করল।'[৯]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করল, কার্যত সে ঈমানের সাথে প্রতারণা করল। রাসূল (সা.) তাই বলেন—

> 'যারা সালাত আদায় করে না, ইসলামে তাদের কোনো অংশীদারত্ব নেই।'

আল কুরআনে আরও একটি আয়াত আছে, যার মধ্য দিয়ে সালাতের অপরিসীম গুরুত্ব ও বরকত অনুধাবন করা যায়। সালাত পড়লে আমরা উচ্চমাত্রার নিয়ামত লাভ করব। আর সালাত ত্যাগ করলে আমাদের করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'এই মুনাফিকরা আল্লাহর সাথে ধোঁকাবাজি করছে। অথচ আল্লাহই তাদের ধোঁকার মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছেন। তারা যখন নামাজের জন্য ওঠে, আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শৈথিল্য সহকারে নিছক লোক দেখানোর জন্য ওঠে এবং আল্লাহকে খুব কমই স্মরণ করে।'[১০]

একবার মুসলিমদের নামাজের বিষয়ে নির্দেশনা দিতে গিয়ে রাসূল (সা.) বলেন—

> 'যারা নিয়মিত ও যথাযথভাবে সালাত আদায় করবে, তারা এর প্রতিদান হিসেবে শেষ বিচারের দিনে নুরের মালিক হবে। এ নুরই সেদিন তার ঈমানের সাক্ষ্য দেবে এবং হাশরের মাঠের সব দুর্ভোগ থেকে তাকে পরিত্রাণ দেবে। কিন্তু যে নিয়মিত ও যথাযথভাবে নামাজ আদায় করবে না, তারা এ নুরের দেখা পাবে না। তাদের জন্য ঈমানের অন্য কোনো নিদর্শনও বরাদ্দ থাকবে না। তারা দুর্যোগ ও কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ারও কোনো

---

[৮] সূরা সাজদাহ : ১৫-১৬
[৯] তিরমিজি, নাসায়ি
[১০] সূরা নিসা : ১৪২

সুযোগ দেখবে না। এ ব্যক্তির চূড়ান্ত পরিণতি হবে কারুন, ফেরাউন, হামান কিংবা উবাই বিন খালাফের মতো।'[১১]

সফলতার চাবিকাঠি

একটু কল্পনা করতে চেষ্টা করুন। যদি আমরা নামাজ অবহেলা করি, তাহলে আমাদের পরিণতি কী হবে। আমরা স্বস্তি ও শান্তি নিয়ে জীবনযাপন করার যে সুযোগটুকু পেতে পারতাম, নামাজ না পড়ায় তা থেকে বঞ্চিত হব। পাশাপাশি আমরা জাহান্নামের আগুনে পোড়ার ঝুঁকিতে পড়ে যাব। রাসূল (সা.) বলেন—

> 'গাছ থেকে পাতা যেভাবে ঝরে পড়ে, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সঠিকভাবে আদায় করলে আমাদের শরীর থেকেও একইভাবে গুনাহগুলো ঝরে পড়ে যায়।'[১২]

তা ছাড়া একটু চিন্তা করলেও বোঝা যায়—পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের শিডিউল এমন সুকৌশলে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন সব সময়ই আমরা নামাজের একটি তাগিদ অনুভব করি। একবার নামাজ পড়ে এসেই আবার পরের ওয়াক্তের নামাজের জন্য মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারি। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> 'নামাজ কায়েম করো, জাকাত দাও এবং রাসূলের আনুগত্য করো। আশা করা যায়, তোমাদের প্রতি করুণা করা হবে।'[১৩]

যারা নামাজ আদায় করে না, তাদের জন্য রয়েছে শুধুই লাঞ্ছনা আর শাস্তি। কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন—

'যেদিন কঠিন সময় এসে পড়বে এবং সিজদা করার জন্য লোকদের ডাকা হবে। কিন্তু তারা সিজদা করতে সক্ষম হবে না। তাদের দৃষ্টি হবে অবনত। হীনতা ও অপমানবোধ তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এর আগে যখন তারা সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল, তখন সিজদার জন্য তাদের ডাকা হতো (কিন্তু তারা অস্বীকৃতি জানাত)।'[১৪]

---

[১১] কারুন ছিল একজন হিব্রু ব্যক্তি, যিনি মুসা (আ.)-কে মানতে অস্বীকার করেছিলেন। ফেরাউন ছিল মুসা (আ.)-এর সময়ে মিশরের দাম্ভিক শাসক। হামান ছিল ফেরাউনের বর্বর প্রধানমন্ত্রী। আর উবাই বিন খালফ ছিল ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমদের ঘোর শত্রু। তাদের সকলেই খুব করুণ পরিণতির মধ্য দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে। তাদের সকলেই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।

[১২] মুসনাদে আহমাদ : ২১০৪৬, সহিহ আত-তারগিব : ৩৮৪

[১৩] সূরা নুর : ৫৬

[১৪] সূরা কালাম : ৪২-৪৩

কীভাবে পাক-পবিত্র হব

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—নামাজের জন্য আমি নিজেকে কীভাবে পাক করব।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিচ্ছন্নতা

এ অধ্যায়ে আমরা আরও কিছু শর্তের কথা জানব, যেগুলো নামাজ আদায়ের আগেই পূরণ করা জরুরি। ইসলামের একটি অনন্যসাধারণ নিয়ম হলো— নিজেদের রবের সামনে উপস্থাপন করার আগে আমাদের পবিত্রতা অর্জন করতে হয়। নামাজ পড়ার জন্য আমাদের অবশ্যই পবিত্র হালতে যেতে হবে এবং মানসিকভাবেও নিজেদের প্রস্তুত হতে হবে। অজু যে শুধু আমাদের শারীরিকভাবে পবিত্র করে, তা নয়; অজু করতে করতে নিজেদের মানসিকতাও পালটে যায়। আমরা তখন অন্তরের গহিন থেকেই রবের সামনে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠতে পারি।

পরিচ্ছন্নতার জন্য রয়েছে দুটি শর্ত। আপনি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পরিষ্কারও হতে পারেন আবার নোংরাও হতে পারেন। হাতে ময়লা আছে আর তা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেললেই সব পরিষ্কার হয়ে যায় না। অজুর মাধ্যমে মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে পবিত্র হয়। নামাজের জন্য একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই নিজেকে নাপাক থেকে পাক করতে হবে। তার শরীরের কোথাও নাজাসা বা দূষিত কিছু থাকতে পারবে না। নাপাক হলে একজন মানুষ নামাজ পড়ার অযোগ্য হয়ে যায়।

তাহারাত বা পবিত্রতা অর্জন করার জন্য নামাজ আদায়ে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে আগে জানতে হবে—কী করলে তিনি আবার নাপাক হয়ে যেতে পারেন। যদি অজু করার পর আবারও এ রকম কিছু হয়, তাহলে তাকে পুনরায় অজু বা গোসল করে পবিত্র হতে হবে।

যেসব কারণে আমরা নাপাক হই

১. প্রস্রাব করলে
২. বর্জ্য নিষ্কাশন করলে
৩. শরীর থেকে রক্ত বা পুঁজ বের হলে
৪. বমি হলে
৫. বায়ু নির্গত হলে

৬. ঘুমিয়ে পড়লে
৭. কোনো কারণে জ্ঞান হারিয়ে ফেললে
৮. নোংরা ও নাপাক কোনো কিছু স্পর্শ করলে।

আরও বড়ো কিছু অপবিত্রতা

১. মাসিক নির্গত হওয়া (মাসিক শেষ না হলে নামাজ আদায় করা যাবে না।)
২. গোপনাঙ্গ থেকে কোনো কিছু নির্গত হওয়া
৩. সহবাসে মিলিত হওয়া
৪. প্রসবপরবর্তী রক্তপাত (নিফাস)

ছোটোখাটো কারণে নাপাক হলে অজু করলেই আবার পবিত্রতা অর্জন করা যায়। তবে বড়ো ঘটনায় নাপাক হলে গোসল করতে হয়। একবার পাক হওয়ার পর একজন ব্যক্তি ততক্ষণই পাক থাকতে পারেন, যতক্ষণ তার সাথে নাপাক হওয়ার মতো কোনো ঘটনা না ঘটে। অজু করার প্রক্রিয়া বেশ সহজ, যা অহরহই আমরা প্রত্যক্ষ করি।

যেভাবে অজু করা হয়

সাধারণভাবে অজুর প্রক্রিয়া বেশ সহজ। অজুর প্রক্রিয়াটি এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেন একজন মানুষ আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিতে পারে। অনেক আগে থেকেই প্রবাদ চালু আছে—

> ‘পরিচ্ছন্নতা মানেই হলো রবের নৈকট্যে আসা।’

রাসূল (সা.) বলেছেন—

> ‘সালাতের প্রধান চাবি হলো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা।’[১৫]

সকল নবি-রাসূল তাঁদের উম্মতকে এই নির্দেশনা দিয়ে গেছেন, যেন তারা আল্লাহর সামনে নিজেদের উপস্থাপন করার আগে পরিচ্ছন্ন হয়ে নেয়। আর সর্বশেষ নবি হিসেবে মুহাম্মাদ (সা.) নিজেই আমাদের অজুর প্রক্রিয়াগুলো শিখিয়ে গেছেন।

---

[১৫] মুসনাদে আহমাদ

জাকাত কী

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—জাকাতের মাধ্যমে আমরা যেভাবে ভালো মানুষে রূপান্তরিত হতে পারি এবং সমাজের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে পারি।

জাকাত কী

জাকাত ইসলামের অন্যতম একটি মৌলিক ইবাদত। আল কুরআনসহ ইসলামের উৎসসমূহে নামাজের পরপরই জাকাতের নামটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। এটি হলো ইসলামের তৃতীয় ভিত্তি। জাকাত শব্দটি দিয়ে 'গরিবের প্রাপ্য' বা সাদাকাকে বোঝানো হয়। কিন্তু জাকাত শব্দের শাব্দিক অর্থ হলো—'কাউকে পরিষ্কার করা, বিশুদ্ধ করা।'

প্রশ্ন হলো—জাকাতের সাথে কারও বিশুদ্ধ হওয়ার কী সম্পর্ক? সহজভাবে বলা যায়—এ পৃথিবীতে এমন অসংখ্য উপকরণ আছে, যেগুলো দুনিয়ায় আগমনের বিশুদ্ধ উদ্দেশ্য তথা আল্লাহর কাছে সমর্পিত হওয়া থেকে আমাদের বিচ্যুত করে ফেলতে পারে।[১৬] তাই যখন আমাদের কোনো পার্থিব সম্পত্তি ছেড়ে দিতে বাধ্য করা হয়, কেবল তখনই আমরা পছন্দের কিছু বস্তুগত জিনিস ছেড়ে দিতে নিজেদের ওপর জোর খাটাতে পারি।[১৭]

> 'মুমিনগণ! তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে না নেয়। যারা এ কারণে গাফেল হয়, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।'[১৮]

আমরা নিজেদের সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ভেতর থেকে পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হই। আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন—

> 'যে আত্মশুদ্ধির জন্য তার ধনসম্পদ দান করে।'[১৯]

মূলত আল্লাহ আমাদের ভেতরকার লোভ-লালসাকে পরীক্ষা করেন। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য আমরা তখনই অনুভব করতে পারি, যখন আমরা আল্লাহর জন্য মুক্তভাবে বিলিয়ে দিতে শিখি। জাকাতকে অন্যান্য সাদাকা বা দান-খয়রাতের মতো মনে করার সুযোগ নেই। কারণ, জাকাত

---

[১৬] সূরা আলে ইমরান : ৯২
[১৭] সূরা বাকারা : ২৭৪, সূরা তাওবা : ১০৩
[১৮] সূরা মুনাফিকুন : ৯
[১৯] সূরা লাইল : ১৮

হলো বাধ্যতামূলক একটি আমল আর দান-সাদাকা হলো একজন ব্যক্তির বাড়তি নেক আমল; যার মধ্য দিয়ে তার আমলনামা আরও বেশি শক্তিশালী হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘তাদের মালামাল থেকে জাকাত গ্রহণ করো, যাতে তুমি সেগুলোকে পবিত্র ও বরকতময় করতে পারো। আর তুমি তাদের জন্য দুআ করো, নিঃসন্দেহে তোমার দুআ তাদের জন্য সান্ত্বনাস্বরূপ। বস্তুত আল্লাহ সবকিছুই শোনেন, জানেন। তারা কি এ কথা জানতে পারেনি যে, আল্লাহ নিজেই বান্দাদের তওবা কবুল করেন এবং জাকাত গ্রহণ করেন? বস্তুত আল্লাহই তওবা কবুলকারী, করুণাময়।’[২০]

> ‘আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভালো কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, জাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবনযাপন করে। এদেরই ওপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।’[২১]

যাদের ওপর জাকাত আবশ্যক

জাকাত দানের শর্ত হলো—

১. অবশ্যই মুসলিম হতে হবে।

২. তার মালিকানায় ন্যূনতম নিসাব পরিমাণ সম্পদ থাকতে হবে। (নিসাব মানে তিন আউন্স স্বর্ণের দামের পরিমাণ অর্থ।)

৩. নিসাব পরিমাণ সম্পদ অন্তত এক বছর তার কাছে জমা থাকতে হবে।

৪. তার ব্যয় নির্বাহের সক্ষমতা থাকতে হবে।

৫. ঋণমুক্ত হতে হবে।

৬. অবশ্যই মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে এবং

৭. প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।

---

[২০] সূরা তাওবা : ১০৩-১০৪

[২১] সূরা তাওবা : ৭১

ইসলামি আইন

একটু ভাবুন তো : *প্রতিটি সমাজেই মানুষের ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু আইন ও সামাজিক মূল্যবোধের প্রয়োজন হয়। যদি কোনো সমাজে আইন ও বিধিবিধান না থাকে, তাহলে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলার চাপে সেটি ধ্বংসও হয়ে যেতে পারে। আপনি কি খবরে বা সংবাদে এমন কোনো শহরের কথা জেনেছেন, যেখানে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি হয়েছে কিংবা নৈরাজ্য ও অশান্তিতে সমাজটি ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে গেছে?*

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—সঠিকভাবে জীবনযাপন করা বলতে আমরা যা বুঝি এবং যেভাবে বিষয়টি অনুধাবন করতে পারি।

শরিয়াহ : ইসলামি পদ্ধতি

শরিয়াহ শব্দের শাব্দিক অর্থ সরল পথ অথবা পানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ। ইসলামের পরিভাষা অনুযায়ী—আল্লাহ আমাদের জন্য যে দ্বীনকে মনোনীত করেছেন, তার আলোকে আইন ও জীবনদর্শনগুলো ব্যাখ্যা করার নামই হলো শরিয়াহ। যখন আপনি ইসলামি পদ্ধতিতে জীবনযাপন করছেন, তখনই শরিয়াহ অনুসরণ করছেন। আর শরিয়াহর জ্ঞান সীমাহীন।

শরিয়াহর মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি—ইসলাম কোন কাজগুলো করতে বলেছে আর কোন কাজগুলো করতে নিষেধ করেছে। কোন বিষয়গুলো হালাল আর কোনগুলো হারাম। কোন কাজগুলো মাকরুহ অর্থাৎ হারাম নয়, অথচ করতেও উৎসাহিত করা হয়নি। ইসলাম যে বিষয়গুলো আমাদের জন্য অনুমোদন করেছে, সেগুলো আমাদের নিরাপত্তার জন্যই জরুরি।

একজন মানুষ যদি যেকোনো নারীকে শয্যাসঙ্গিনী বানায়, তাহলে তার এইডসের মতো ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ধরনের পরিস্থিতি আমাদের জন্য কখনোই কল্যাণকর হতে পারে না; বরং এগুলো খুবই বিপজ্জনক। এ কারণেই ইসলামে ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

একইভাবে মদপান করাও শরীরের জন্য ক্ষতিকর। তাই অমুসলিম দেশে মদপান খুব স্বাভাবিক হলেও ইসলাম তা নিষেধ করেছে। তা ছাড়া মদপানে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। আল্লাহ এ সম্পর্কে বলেছেন—

‘তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এতদুভয়ের মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের জন্য উপকারিতাও রয়েছে, তবে উপকারিতার তুলনায় পাপের মাত্রা অনেক বেশি।’[২২]

হুদুদ বলে একটি শব্দ আছে। এটি হলো—আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমানা। ভালো ও মন্দ কাজের নির্ধারিত প্রান্তবিন্দু। ইসলামের বিধান খুবই স্পষ্ট ও সহজ। আল্লাহ যেগুলোকে হারাম বলে ঘোষণা করেননি, তার সবই হালাল। এ কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন—‘আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য কিছু আমল নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই এ আমলগুলোকে অবহেলা করো না। তিনি কিছু সীমানা নির্ধারণ করেছেন। তাই এগুলোকে অমান্য করো না। তোমাদের প্রতি করুণার অংশ হিসেবে কিছু বিষয়ে তিনি নীরব থেকেছেন (কোনো স্পষ্ট মতামত দেননি), তাই এগুলো নিয়ে খুব বেশি প্রশ্ন করো না।’

হালাল
এমন সব কাজ, যা কুরআন ও সুন্নাহ অনুমোদন করেছে কিংবা যেগুলোর বিষয়ে রাসূল (সা.) নীরব ছিলেন।

মাকরুহ
এমন কাজ, যেগুলো আল্লাহ নিষেধ করেননি অথচ হালালের সীমানা বা মানদণ্ড লঙ্ঘনের প্রায় কাছাকাছি।

হারাম
এমন সব বিষয়, যেগুলো কুরআন ও সুন্নাহতে স্পষ্টত নিষেধ করা হয়েছে। কিংবা এমন যেকোনো কাজ, যা ইসলামের মূল চেতনার সাথে পুরোপুরি সাংঘর্ষিক।

ইসলামি পদ্ধতি অনুধাবন

শরিয়াহ হলো আমাদের অনুসরণের জন্য সঠিকতম পথ। এর দুটো মৌলিক উৎস রয়েছে। একটি হলো কুরআন আর অপরটি সুন্নাহ। রাসূল (সা.) বিদায় হজের ভাষণে আমাদের এই দুটি উৎস সম্পর্কে জানিয়েছেন এবং এগুলোকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছেন। ঈমানের মৌলিক বিধিবিধানসমূহ, অপরের সাথে মুয়ামালাত, হালাল-হারামের নীতিমালা—এই বিষয়গুলো আমরা কুরআন-সুন্নাহর মাধ্যমেই জানতে পারি।

কুরআনের কোনো আয়াত বা নবিজির কোনো হাদিসের ব্যাখ্যা অনেক সময় একেকজন স্কলার একেক ভাবে দেন। আবার কখনো কখনো এমন কিছু পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যা আগে কখনোই দেখা যায়নি। ধরা যাক, টেস্টটিউব বাচ্চাদের জন্মদান প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে ইসলামের অবস্থান কী? এসব বাস্তবতার ঊর্ধ্বে ওঠার জন্য মুসলিমরা একটি আইনি কাঠামো নির্মাণ করেছে, যার নাম হলো ফিকাহ।

---

[২২] সূরা বাকারা : ২১৯

মাজহাবসমূহ

একটু ভাবুন তো : *প্রতিটি কাজের ব্যাপারেই মানুষের আলাদা আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে। কোনো কোনো সমস্যার সমাধান করা যায় একাধিক উপায়ে। একটি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের সকল উপকরণই কুরআন ও সুন্নাহতে বিস্তারিতভাবে সন্নিবেশিত রয়েছে। কিন্তু কিছু কিছু আলোচনা এমন পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যেখানে নানাভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ আছে; এমনকি অবকাশ আছে মতপার্থক্য করারও।*

> এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—মাজহাবের উদ্দেশ্য।

প্রাত্যহিক জীবনে শরিয়াহ

শরিয়াহ মূলত আল্লাহর আদেশ ও রাসূল (সা.)-এর নির্দেশনাগুলোর সমন্বিত একটি রূপ, যা দেওয়া হয়েছে আমাদের জীবনকে সুন্দর করার জন্যই। এর যেকোনো জটিল সমস্যা নিরসনের প্রয়োজনে স্কলারগণ ইজতিহাদ করতে পারেন। শরিয়াহর উৎসমূল চারটি। এগুলো হলো—কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। প্রাথমিক পর্যায়ের কোনো কোনো স্কলার ইসলামকে সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে শরিয়াহকে সহজ করার চেষ্টা করেছিলেন।

কারণ, অনেকেরই কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে পড়াশোনা করার যথেষ্ট সময় ছিল না। আবার সকলে ইজাতিহাদ করার মতো যোগ্যও ছিলেন না। আর তারা ইসলামের গভীরে না গিয়ে কেবল জানতে আগ্রহী ছিলেন—কোনটি করা যাবে, কোনটি করা যাবে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্কলারগণ জীবনের সবকিছু বিলিয়ে দিয়ে ইসলামি শরিয়াহ নিয়ে পর্যালোচনা করে গেছেন এবং এর বিভিন্ন বিষয় মানুষের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামের ইতিহাসে অসংখ্য পুরুষ ও নারী কেবল এ কাজটিই করে গেছেন।

এই স্কলারগণ নিরন্তরভাবে কাজ করে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাখ্যাসমেত অসংখ্য বইপুস্তক লিখেছেন, মানুষকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে করেছেন সচেতন। হালাল ও হারামের বিষয়গুলো স্পষ্ট করেছেন। এ কারণে তাঁদের অনেকেই জালিম শাসকদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছেন। স্বৈরাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কথা বলার কারণে বছরের পর বছর জেলে কাটাতে হয়েছে। এরপরও তাঁরা সামর্থ্যের সবটুকু উজাড় করে ছড়িয়ে গেছেন শরিয়াহর জ্ঞান।

পাঁচজন শ্রেষ্ঠ স্কলার

ইসলামের ইতিহাসের যে পাঁচজন স্কলারকে আমরা সবচেয়ে বেশি স্মরণ করি, তাঁরা হলেন ইমাম আবু হানিফা (রহ.), ইমাম মালেক (রহ.), ইমাম শাফেয়ি (রহ.), ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) ও ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)। অধিকাংশ মুসলিমই প্রথম চার ইমামকে নানা প্রেক্ষিতে অনুসরণ করেছেন। আমরা তাঁদের কথা স্মরণ করি, কারণ তাঁদের প্রত্যেকের অধীনে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক ছাত্র ছিলেন। এই ছাত্রগণ ইসলামের গবেষণা ও শরিয়াহর আইনকে পর্যালোচনা করার কাজটি চালিয়ে গেছেন।

তাই তাঁদের চিন্তাধারাগুলো আজ এত বছর পরে এসেও আলোচিত হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই স্কলারগণ ইসলামকে আরও বিস্তারিত ও পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁরা দ্বীনি কাঠামোতে নতুন করে কিছু যোগ করেননি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ইমাম মালেক (রহ.) কখনোই চাননি—মুসলিমরা কুরআন ও সুন্নাহকে বাদ দিয়ে তাঁকে বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে অনুসরণ করুক। তিনি বলেছিলেন—

> ‘রাসূল (সা.) ছাড়া অন্য যত মানুষ আছেন, তাদের মুখনিঃসৃত বাক্যগুলোকে ক্ষেত্রবিশেষে গ্রহণ করার পাশাপাশি বর্জন করারও সুযোগ আছে।’

প্রত্যেক ইমামই স্বীকার করতেন—তাঁরা কেউ শতভাগ বিশুদ্ধ নন। অন্যরাও তাঁদের চেয়ে ভালো করে ইসলামকে জানতে ও বুঝতে পারে। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একবার বলেছিলেন—

> ‘আমার মতামতগুলো সঠিক; আবার তা ভুল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে। আবার আমার বিপরীত যে মতটিকে আমি ভুল মনে করছি, হতে পারে তা-ই সঠিক।’[২৩]

প্রত্যেক ইমামই ছিলেন পণ্ডিত ও শিক্ষক। যদিও শরিয়াহ ও ফিকাহতে আরও অনেকেই কাজ করেছেন, কিন্তু উপরিউক্ত পাঁচজন ইমাম সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছেন। এই ইমামগণের ইন্তেকালের পর তাঁদের ছাত্ররা গঠন করেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক কিছু ফোরাম। এই সকল ফোরামে তাঁরা তাঁদের ওস্তাদদের চিন্তাধারাকে লালন করেছেন। নানা কৌশলে ও পন্থায় তাঁরা ইমামদের কাজগুলোকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো—ইমামগণ নিজেরা যা জানতেন, তার সবটাই ছাত্রদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে এই ছাত্ররা শিক্ষক হয়েছেন এবং তাঁদের ছাত্রদের হুবহু তা শিখিয়েছেন। প্রতিটি প্রজন্মেই পূর্ববর্তীদের জ্ঞানের সাথে নতুন করে আরও কিছু বিষয়াদি যুক্ত হয়েছে। এভাবেই একটি সক্রিয় চিন্তাকাঠামো দাঁড়িয়ে গেছে, যেগুলোকে আমরা এখন মাজহাব নামে চিনি।

---

[২৩] *আল খিলাফু আসবাবুহু ওয়া আদাবুহু*, খ.-১, পৃ.-২৪

ইমামদের নাম	গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য
ইমাম আবু হানিফা (রহ.)	জীবনকাল : ৭০৩-৭৬৭ খ্রি.। জন্মস্থান : ইরাক। পড়াশোনা করেছেন মদিনায়।
ইমাম শাফেয়ি (রহ.)	জীবনকাল : ৭৬৯-৮২০ খ্রি.। জন্মস্থান : ফিলিস্তিন। মদিনায় তিনি ইমাম মালেক (রহ.)-এর অধীনে কিছুদিন অধ্যয়ন করেছেন। ফিকাহশাস্ত্রের মৌলিক কিছু কাঠামো প্রবর্তন করেছিলেন তিনি।
ইমাম মালেক বিন আনাস (রহ.)	জীবনকাল : ৭১৭-৮০১ খ্রি.। জন্মস্থান : মদিনা, সৌদি আরব। তাঁর বিখ্যাত বই *আল মুয়াত্তা*। এই বইটি তিনি খলিফা হারুন অর-রশিদের অনুরোধে লিখেছিলেন।
ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)	জীবনকাল : ৭৭৮-৮৫৫ খ্রি.। জন্মস্থান : বাগদাদ। তিনি মদিনায় কিছুদিন ইমাম শাফেয়ি (রহ.)-এর কাছে অধ্যয়ন করেছেন।
ইমাম জাফর আস-সাদিক (রহ.)	জীবনকাল : ৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.। জন্মস্থান : সৌদি আরব। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত আলিম। রাসূল (সা.)-এর বংশধর। রসায়নবিদ হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি মদিনাসহ আরও অনেক স্থানে গিয়ে জ্ঞান অন্বেষণ করেছেন।

বর্তমান বাস্তবতায় মাজহাব

বর্তমানে পৃথিবীতে পাঁচটি মাজহাব কার্যকর রয়েছে। এগুলো হলো—মালেকি, হানাফি, শাফেয়ি, হাম্বলি ও জাফরি। প্রতিটি মাজহাবের নাম যার যার প্রথম ওস্তাদের নামানুসারেই রাখা হয়েছে। প্রতিটি মাজহাবেরই মূলভিত্তি হলো কুরআন ও সুন্নাহ। একেবারে নতুন কোনো ইস্যু এলেই কেবল তাঁরা ইজতিহাদ প্রয়োগ করতেন। ছোটো ছোটো কিছু ইস্যুতে তাঁদের মতপার্থক্য ছিল, তবে ইসলামের মৌলিক সব বিষয়েই তাঁরা ছিলেন শতভাগ একমত।